সবার প্রিয় সানাউল্লাহ নূরী

শরীফ আবদুল গোফরান

সবার প্রিয় সানাউল্লাহ নূরী

শরীফ আবদুল গোফরান

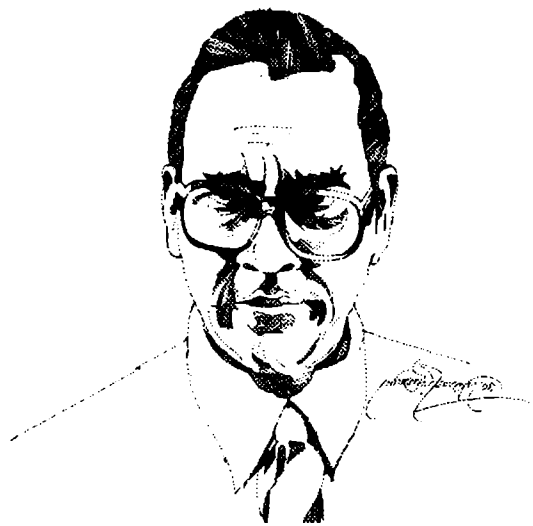

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ – মোমিন উদ্দীন খালেদ

www.phulkuri.org.bd

সবার প্রিয় সানাউল্লাহ নূরী

শরীফ আবদুল গোফরান

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা-২০০৫
গ্রন্থস্বত্ব – উম্মে আরজুম

প্রকাশক
রবিউল হক মাসুদ
ছায়াবীথি প্রকাশন
৪৩৫/এ/২ বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

মূল্য – পঞ্চাশ টাকা

www.phulkuri.org.bd

উৎসর্গ

আবুল আসাদ

শ্রদ্ধাভাজনেষু

www.phulkuri.org.bd

লেখকের অন্যান্য বই

ছোটদের ফররুখ - জীবনী
ফুলে ফুলে প্রজাপতি - গল্প
নাওনদী নীলাকাশ - কিশোর কবিতা
সুবাসিত ভোর - গল্প
টাপুর টুপুর টুপ - ছড়া
বড় মানুষের গল্প - জীবনী, প্রকাশিতব্য

www.phulkuri.org.bd

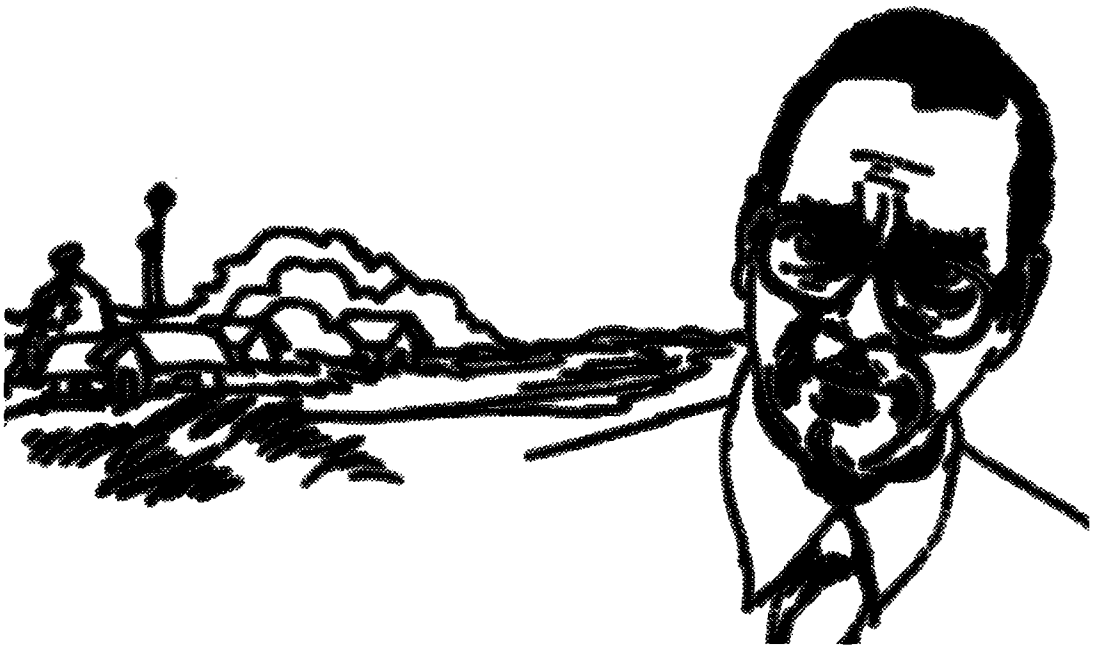

রূপ কথার রাজা

লক্ষীপুরের ছোট্ট একটি গ্রাম। নাম চরফলকন। গ্রামটি খুবই সুন্দর, অপূর্ব। দেখতে যেন ছবির মত। চারদিকে সবুজের মাতামাতি। সারি সারি বনবীথি। পথের দুধারে থরে থরে সাজানো গাছপালা। পাশে ধানক্ষেত। যেন সবুজের মেলা। তারই পাশ ঘেঁষে চলে গেছে গাঁয়ের আঁকাবাঁকা মেঠো পথ। ভোরের সোনামাখা রোদ গ্রামটিকে সোনালী রঙে রাঙিয়ে তোলে। রাতের জোসনালোকে গ্রামটির রূপ যেন অপরূপ হয়ে ধরা দেয়। এই রূপ দেখতে দেখতে একটি ছেলে হারিয়ে যেতেন কল্পনার রাজ্যে। সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিতেন তিনি। পরীর দেশসহ আরো কত রাজ্যের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। পৃথিবীর বহু সাগর মহাসাগর পাড়ি দিয়েছেন। তার মনোজগতে

www.phulkuri.org.bd

জমা হত নতুন অভিজ্ঞতা। যা দিয়ে পরে তৈরী করলেন এক নতুন রূপকথার রাজ্য। যে রাজ্যে শিশুদের নিয়ে তিনি বিচরণ করতেন। কারণ তিনিতো সে রাজ্যের রাজা। মহারাজা। তা হলে কে এই রাজা? কি তার নাম? তিনি হলেন, ছোট বড় সবার প্রিয় বন্ধু। চির সবুজ এক মনীষী সানাউল্লাহ নূরী।

১৯২৮ সাল। আটাশ মে। বাংলা সন ১৩৩৫। জ্যৈষ্ঠ মাসের পনের তারিখ। দিনটা ছিলো সোমবার। ঘুম ভেঙেছে পাখিদের। চারদিকে কিচির মিচির ডাকাডাকি। যাকে বলে কাকডাকা ভোর। পূবের আকাশ অল্প অল্প করে ফর্সা হতে শুরু করেছে। তবে বাড়ির চারপাশের সুপারি নারকেলের বাগিচায় তখনো লেপ্টে আছে হাল্কা অন্ধকার। এ রকম একটা আধো আলো আধো আঁধারিতে পৃথিবীতে এলেন সবার প্রিয় বন্ধু সানা উল্লাহ নূরী। ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছুক্ষণ পরই গ্রামের মসজিদ থেকে ভেসে আসে ফজরের আযান ধ্বনি। আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাউম।

সে বছর প্রচুর আম ধরেছিল। জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি সময়টায় এমনিতেই আম পাকার ধুম পড়ে যায়। সোমবার ভোর বেলায়, বিশেষ করে আমের মিষ্টি সৌরভে ভরা একটি মওসুমে ছেলেটির জন্ম হওয়ায় বাড়ির সবাই শুভ লক্ষণ বলে মনে করলেন। তাঁদের ধারণা, বড় হলে ছেলেটি অনেক উচ্চ শিক্ষিত হবে বাবার চাইতেও বেশি নামী দামী হবে। বেশ নাদুস নুদুস। মায়ের কোল যেন আলোকিত হয়ে গেলো। তখন গ্রামে এখনকার মতো কোন পল্লী হাসপাতালের কথা কল্পনাও করা যেতো না। যেখানে এই শিশুর জন্ম হয়েছে, মা এবং শিশু দু'জনই আশা করতে পারে না অভিজ্ঞ চিকিৎসক আর নার্সের সেবাযত্ন। শিক্ষিত পরিবার হলেও গ্রামের আর দশজন মধ্যবিত্তের ঘরোয়া আবহাওয়ায় এক আটপৌরে পরিবেশে তাঁর জন্ম।

গ্রামদেশে শিশুর জন্ম হলে গরম পানি করে ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করা হয়। আগুন জ্বেলে সাতদিন পর্যন্ত আঁতুড় ঘরটা গরম রাখে। বাঁশের ধারালো আধ হাত লম্বা একটা চটা দিয়ে নাড়ি কেটে চেরাগের সলতে পোড়া কালি আর সর্ষের তেল মেখে দেয়া হয়। এ কাজটা গ্রামের অশিক্ষিত কোন কোন ধাত্রী মহিলাকে দিয়ে করা হয়। বিনিময়ে তাকে কি দেয়া হতো জানো? নতুন শাড়ি, চাল, তেল, ডিম, পান ও মরিচ, এর সাথে নগদ কড়িও কিছু দেয়া হতো উপরি বখশিশ হিসাবে। শিশু নূরীর ব্যাপারেও তাই করা হলো। একটুও ত্রুটি করা হয়নি। নূরী তাঁর একটি লেখায় নিজের কথা নিজে বলেছেন এই ভাবে-

www.phulkuri.org.bd

"ছোট সময়ে সে ধাত্রীটিকে আমি অনেকবার দেখেছি। সে প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসতো। প্রতিবারই সে কিছু কিছু উপহার নিয়ে যেতো মায়ের কাছ থেকে। এক বেলাতো খেতই। তার উপর নিতো দেড় দু'সের চাল, শুকনো মরিচ ও পেঁয়াজ। আগে বেশ মনে পড়তো তাকে। এখনো ছবির মতো ভাসে তার চেহারাটা।

মহিলাটিকে দেখলে মা খুব খুশী হতেন, আদর করে বসতে দিতেন পিঁড়ি পেতে। সাথে সাথে এগিয়ে দিতেন পানের বরতন।"

নারী শিক্ষার সুযোগবিহীন সেকালের অজ-পাড়াগাঁয়ে কেমন করে নবজাতকের সেবায় অভিজ্ঞতায় পারংগম হয় দরিদ্র ঘরের এই শুশ্রূষাকারিনীরা এটি একটি অবাক ব্যপার।

নূরী ভাইয়ের মা ছিলেন খাঁটি দরাজদিল মহিলা। মানুষের জন্য সবকিছু বিলিয়ে দেয়ার যে ব্যাকুলতা তা ছিল তাঁর মধ্যে। কেউ কখনো কিছু চাইলে না করতেন না। লুকিয়ে ছাপিয়ে হর হামেশা সাহায্য করতেন দরিদ্র দুর্গতদের। শাড়ির খুটে চাল বেঁধে নিয়ে বিলাতেন গ্রামের দরিদ্র লোকদের মধ্যে।

হিংসুক লোকের কুনজর পড়ার ভয়ে শিশু নূরীর কপালের ডানপাশে একটা বড় কালো কাজলের টিপ দিয়ে রাখতেন মা। খুব নাদুস নুদুস ছিলেন তিনি। তিনমাস বয়সেও তাঁকে কোলে নিতে অনেকের কষ্ট হতো। দাদীর চোখ ছিলো ছানিপড়া। তখন দাদীর বয়স একশ বছরের বেশি। ঐ বয়সেও দাদী তাকে কোলে নিয়ে আদর করতে চাইতেন। কিন্তু তার ভারিক্কি স্বাস্থ্যের জন্য কোলে নিতে পারতেন না। ঠ্যাং মেলে তাকে পায়ের উপর শোয়ায়ে কত ছড়া-ই না কাটতেন। পা দোলাতে দোলাতে চুমোতে চুমোতে গাল ভরে দিতেন। এক সময় দাদী-নাতী দু'জনেই হারিয়ে যেতেন বঙ্গোপসাগরের রূপকথার মাঝে।

মানুষের জীবন সময়ের কাছে বন্দী। এর মাঝে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষ এগিয়ে যায়। বাঁচার জন্য করতে হয় কাজকর্ম। বলতে হয় নানা ধরনের কথাবার্তা। মানুষের জীবনের প্রথম ভাগের কিছু কথা, কিছু কাজকর্ম, জীবনের ফাঁকে ফাঁকে মনের দোলনায় দোলা দিয়ে যায়। তা-ই হচ্ছে শৈশবস্মৃতি। শৈশবের স্মৃতিগুলো মানুষকে হাসায়, কাঁদায় আবার বেশ শিহরণও জাগায়। ঠিক তেমনি ছিল সানাউল্লাহ নূরীর ফেলে আসা বিগত দিনগুলোর কিছু কথা। সেই ধারাবাহিকতায় শুরুতেই এসে যায় শৈশবের কথা।

www.phulkuri.org.bd

শৈশব

পৃথিবীর অন্যসব দেশের শিশুদের মতো আমাদের শিশুরাও মায়ের অথবা দাদীর কোলে ঘুমায় গান আর গল্প শুনতে শুনতে। আমরা যাকে বলি শিশুতোষ গান বা ঘুম পাড়ানো গান। যেমন-

"ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিবো কিসে?"
ধান পুরালো পান পুরালো
খাজনার উপায় কি?
আর ক'টাদিন সবুর কর
রসুন বুনেছি।

আর গল্প! তাদের গল্পকে বলা হয় রূপকথার গল্প। নূরী ভাইয়ের বেলায়ও এমন ঘটেছে। তার ছিল এরকম একজন স্নেহপরায়ণা বুদ্ধিমতী দাদী। তিনি বলতেন, "দাদীর কথা ভাবলে আমি হঠাৎ এক অশ্বারোহী কিশোর যোদ্ধা হয়ে চলে যাই রূপকথার জগতে।" অরণ্যের বৃক্ষ শাখায় দোলনা ঝুলিয়ে মুখে মুখে সুর করে ছন্দ মিলিয়ে দাদী শিশু নূরীকে কত ছড়াই না শোনাতেন। শিশু নূরী যখন একটু বড় হলেন তখন তিনি নিজেই দাদীকে গল্প বলতে বাধ্য করতেন। দাদীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে দাদীর মুখে গল্প শুনতেন। দাদী আদুরে নাতির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলতেন, এক টাল মাটাল সাগর। তার কূল আছে। কিন্তু আরেক কূল? কেউ জানে না সেই ঠিকানা। চোখের সামনে কেবল ধু-ধু কুয়াশা। চাইতে গেলে ঘোর লাগে চোখে। পাহাড়ের মতন উঁচু একেকটা ঢেউ। সেই ঢেউয়ের বুকে ফণা তোলে মহা নাগ। লক্ষ মানিক হয়ে জ্বলে নাগের মাথার মণি। লক্ষ দৈত্য কাড়াকাড়ি করে সেই মানিক নিয়ে। তাদের দাপাদাপিতে উথাল-পাথাল করতো সাগরের পানি। সেই পানিতে ঘূর্ণিঝড় তোলে লক্ষ মাতাল ঘোড়া। সেই ঘূর্ণির ঝাপটায় দুরু দুরু কাঁপে পৃথিবী। কাঁপে তরু-লতা। ভয়ে চুপসে যায় পাখ-পাখালি। শুকিয়ে যায় জীবনের প্রাণ। কিন্তু ভয় পায় না কেবল একজন। আর অমনি নূরী জিজ্ঞেস করতেন, কি বলো দাদী এ কী কথা। দৈত্য দানবের ভয় নেই এমন মানুষ আছে নাকি কোথাও?
আছে, আছে। দাদু ভাই সে কথাই তো বলছি। শোন তাহলে। নাম তার চম্পাবতী।
এমনিভাবে গল্প শুনতে শুনতে ছোট্ট নূরী এক সময় ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যেতেন। বড় হয়ে তিনি দাদীর কাছে শোনা ওসব রূপকথার গল্পকে কত সুন্দর করে সাজিয়ে কত মজার মজার গল্পই না লিখেছেন। যেমন ধরো নীল পংখ, সাত পদ্মকন্যা, মন পবনের নাও, সাগর কন্যা চম্পাবতী, সাগর কূলের গাঁ, কালো ভোমর, আরো কত কি।

সাত-আট বছর বয়সে নূরী গাছে উঠতে শিখেছে। লবণের সাথে দু'একটা কাঁচা মরিচ মিশিয়ে কেমন করে সুসাদু কাঁচা-মিঠা আম গলধঃকরণ করতে হয় সেই বিদ্যাও বেশ রপ্ত হয়ে যায় তার। বাড়িতে চাচাত জেঠাতো বোন, ভাবীরা তাকে খুব আদর করতেন। তাদের সাথে তিনি মজা করে আম খেতেন।

আমের মওসুমে সবসময় একটি ছুরি থাকতো তার লুঙ্গির কোমরের দিককার বাঁধনের তলায়। গাছের মাঝখানের ডালে উঠে ছুরিতে-কাঁচা কাঁচা আমের ফালি লবণ মেখে খেতেন তিনি। আর পুকুরের ঘাটে পানি আনতে যাওয়ার সময় রসিকতা করে একহাত দেখিয়ে দেয়ার মতলবে কাঁচা বা পাকা আমের চামড়া এবং আঁটি নিচে লাগসই করে ভাবীদের মাথায় ফেলতেন। যেমন করে কাক কিংবা বাদুড় ফল খেয়ে আধা-খাওয়া আঁটি নিচে ফেলে দেয়। ভাবীরা মাথায় আচমকা আঘাত খেয়ে হকচকিয়ে গিয়ে ওপরের দিকে তাকাতেন। আর তখন নূরী গাছের ঘন ডালপাতার আড়ালে লুকিয়ে যেতেন। ব্যাপারটা তারা সহজে ধরতে পারতেন না। ভাবতেন কোন বেয়াড়া কাকের কান্ড এটা। শেষে দৃষ্টির তীক্ষ্ণ টর্চ ফেলে নূরীকে পাতার ভেতর দেখতে পেয়ে চোখ পাকিয়ে বলতেন, "ওরে দুষ্ট দেবর, তোমার কাণ্ড এইটা! হ, গাছের থন, নাইমবা না? তখন টের পাইবা, আমরাও কেমন মজা দেখাইতে পারি।"

মাথায় লেগে থাকা আমের ভুক্তাবশেষের এঁটো তারা ঝাড়তেন শাড়ির আঁচলে। কিন্তু চুল থেকে কি সহজে মুছে ফেলা যায় আমের রসের চটচটা আঠা? এর জন্যে অবেলায় নামতে হতো পুকুরে। আর সাবান দিয়ে ঘষে মেজে সাফ করতে হতো আমের আঠালো রস। কলসি কাখে নিয়ে ঘরে ফেরার সময় ফের ওপরের দিকে তাকাতেন তারা। শাসিয়ে বলতেন, এক মাঘে শীত যায় না গো দেবর। আমাগো হাতে যখন পইড়বা, পানের লগে মরিচ মাখি খাওয়ামু তখন। আর নাকানি চুবানি খাওয়ামু যখন গোসল কইরতে নাইমবা পুকুরে। হ, মনে থাকে যেন কথা গুলাইন। তখন নূরী বলতো, আচ্ছা মনে থাইকবে ভাবীজানেরা।

মওকা পেয়ে শৈশবের রসিকতার দুষ্টুমির ওরকম প্রতিশোধ ভাবীরা বহুবার নিয়েছিলেন। তারা নূরীকে গাছাল এবং কখনো কখনো গাছুয়া ইঁদুর বলে বিদ্রুপ করতেন। কথাটি একেবারে ফেলে দেয়ারও নয়।

www.phulkuri.org.bd

দুই মায়ের ছেলে

এক খাটে ঘুমাতেন তাঁর মা এবং বড় মা। ঘুমের মধ্যে তাঁর মাথা থাকতো মায়ের বুকের কাছে আর পা দু'টি থাকতো বড় মায়ের কোলের ওপর। নবজাতক হিসাবে দুই মাকে সন্তান বাৎসল্যের স্বাদ উপভোগের প্রায় সমান সুযোগ দেয়ার প্রবণতা যেমন করে সঞ্চারিত হয়েছিলো তার মধ্যে তা ভাবলে সবার কাছে অবাক লাগবে।

নূরী বেড়ে ওঠেন দুই মায়ের একান্ত সান্নিধ্যে, আর অপার স্নেহে। দু'জনের কে তার জন্য ধাত্রী মা এবং কে সৎ মা এটা নয়-দশ বছর বয়স হবার পরও বুঝে উঠতে পারেননি তিনি। এ বিষয়টা তার কাছে কেমন ভাসা-ভাসা আর রহস্যজনক মনে হতো। মজার ব্যাপার হলো, দু'জনকেই তিনি জীবনভর মা বলে ডাকতেন। তিনি কখনো আলাদাভাবে শুধু মা এবং বড় মা বলে ডাকেননি। এতে যে সমস্যা হতো না তা নয়। কিছু না কিছুতো বিভ্রান্তি ঘটতোই। তিনি যদি কখনো মা বলে ডাক দিতেন, তখন দু'জনই জবাব দিতেন। নূরী মুখ বাড়িয়ে বলতেন, তোমাকে নয়, ওই মাকে। এভাবে এক ব্যতিক্রমী যুগ্ম মাতৃত্বের স্নেহ ছায়াতলে পিতার একমাত্র সন্তান হিসেবে কেটেছে তার শৈশব এবং

কৈশোর।

রাতে যখন ঘুমাতে যেতেন, তখন মায়ের কাছে শোনা গল্পগুলো তার মাথায় কিলবিল করতো। চোখের সামনে ভাসতো সবুজ পত্র-পল্লবে ছায়াঢাকা প্রকান্ড এক গাছের ছবি। তার ডালে পাতার সাথে একাকার হয়ে ঝুলে আছেন তিনি, আঙ্গুলের মতো ক্ষুদে এক পুতুল হয়ে। তারপর ওই গাছে কেটেছে তার লাখো কোটি বছর। তারপর হঠাৎ তাকে পাঠানো হলো পৃথিবীতে।

বারো বছরের সিঁড়িতে ওঠার পর নূরী বুঝতে শিখেন মানুষের মা একজনই থাকেন। একটানা তিন বছর ধরে পান করেছে যে স্নেহশীলা জননীর বুকের অমৃত সুধা, তাকে চিনতে তখন আর ভুল হলো না। তবে তার গর্ভধারিনী মা বরাবরই তার নিঃসন্তান বড় মাকে ভালোবাসতে শিখান।

কিশোর বয়সে তিনি প্রায় গাছে গাছেই কাটাতেন। তাল, জাম, নারকেল কিংবা সুপারি গাছে ওঠার জন্যে কখনো পায়ে দড়ির বাঁধন লাগতো না তার। বারো তেরো বছর বয়সে আয়ত্ব করেছিলেন খালি পায়ে-হাতে বেড় পাওয়া যে কোনো গাছের বুক সাপটে ধরে তরতর করে মগডালে ওঠার কেরামতি বা কৌশল। নারকেল গাছে উঠে আস্ত একটা থোকার চার-পাঁচটা ডাব কোঁচড়ের ছুরি দিয়ে পেড়ে খেতেন ভেতরকার মিষ্টি ঠাণ্ডা পানি। থোকায় যেমনকার ডাব তেমনি থাকতো। দিন কয়েক পর শুকিয়ে গেলে বাড়ির লোকেরা মনে করতো ওটা নেংটি ইঁদুরের কাণ্ড। কারণ বড় বড় নারকেল গাছগুলোতে ইঁদুরেরা প্রায়ই বাসা বেঁধে থাকতো।

এক দিনের ঘটনা। নূরী তখন ক্লাস থ্রির ছাত্র। বয়স দশ বছরের মতন। শালিকের বাসা খুঁজতে উঠলেন এক গাছে। ওপরের দিকে উঠবার আগেই নর আর নারী শালিক জোড়া গলা উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠে গেলো অন্য গাছে। এ সময় কাকেরাও প্রতিবাদী স্বরে চেঁচাতে শুরু করেছিলো। কিন্তু মহাবিপদের মুখে পড়বার আগে কিছুতেই তিনি বুঝেননি কেন শালিক এবং কাকেরা জোট বেধে এমনভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

তিনি মগডালে যখন উঠে গেছেন তখন দেখলেন শালিকের বাসায় হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে প্রায় বারো হাত লম্বা কুচকুচে কালো রঙের একটি সাপ। নূরীর উপস্থিতি টের পেয়ে সাপটা প্রায় উড়ে গিয়েছিলো। তার চিৎকারের শব্দ শুনে, বাবা ছুটে এসে দিলেন। ওটা গোখরা নয়, দাঁড়াস সাপ। ভয়ের কারণ নেই। মগডাল ধরে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নাও। বুকের কাঁপুনি কমলে আস্তে আস্তে নেমে আস।

গাছে গাছে ঘুরে বেড়িয়ে যেসব রহস্য তিনি খুঁজে পান তা বড় হয়ে কত সুন্দর করে ছড়ার

www.phulkuri.org.bd

মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও নূরী ভাই ওসব দিনের কথা ভোলেননি। একটুখানি খোঁচা দিলেই তার ভেতর থেকে পুরানো দিনের কথাগুলো টেপরেকর্ডের মত বেজে উঠতো।

নূরী ছোটবেলায় খুব দুষ্টুমি করতেন। তিনি যখন বয়োবৃদ্ধ তখন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ওসব দিনের কথাগুলোকে কত মজা করে বলতেন। তাঁর স্মৃতিচারণগুলো রূপকথার গল্পের মতোই মনে হতো। ওসব শুনতে একটুও বিরক্তি লাগতো না। বাল্যবয়সে তার সেই চিরন্তন কৌতূহলগুলো আজো সবার মাঝে জাগে।

বুদ্ধি হওয়ার পরই তার জন্মসূত্রের ভাবনাটা তাকে পেয়ে বসে। আগেই বলেছি তিনি ছিলেন দুই মায়ের এক সন্তান। তাঁর বাবা-দুই বিয়ে করেছিলেন। বড় মায়ের কোন সন্তানাদি ছিলো না। তার কোনো সন্তান হবে না জেনে বাবাকে দাদী বাধ্য করেছিলেন আর একটি বিয়ে করতে। তিনি এই ঘরে পিতার ওরসজাত একমাত্র জীবিত সন্তান। এক অসাধারণ মানবতাবোধ দ্বারা সারাজীবন উদ্বুদ্ধ ছিলেন তার আধ্যাত্মসাধক দার্শনিক পিতা।

সন্তানহীনতার যন্ত্রণায় আমৃত্যু মর্মপীড়া ভোগ করবেন তার সংসারের এই বন্ধ্যা নারী; এটা তিনি ভাবতে পারতেন না। নূরীর জন্মের পর তাই তিনি বড় মা'র কোলে তাকে তুলে দিলেন। "বললেন, আজ থেকে নিজের পেটের সন্তানের মতন একে লালন-পালন করবে তুমি। এরপর কখনো ভাববে না নূরী তোমার সন্তান নয়। সে তোমারো বুক জুড়াবে।" বড় মা তাকে দুই হাতে কাপড়ে জড়িয়ে বুকের ভেতর নিয়ে কপালে চুমু খেয়েছিলেন। খুশিতে চকচক করে উঠেছিলো তাঁর দুই চোখ। সেই থেকে তিনি নূরীকে নিজের ছেলের মতনই আদর করতেন। বাবা বাইরে থাকলে তাকে মাঝখানে রেখে দুই মা ঘুমাতেন। তাদের দু'জনকে সমানভাবে সম্মান করতে তিনি তাকে শিখিয়েছেন। নূরী আজীবন এদের দু'জনের মর্যাদা আর প্রাপ্যের ক্ষেত্রে কোনো রকম তারতম্য বুঝতে দেননি।

নূরীর মায়ের মৃত্যুর পর এক যুগেরও বেশি জীবিত ছিলেন বড় মা। এ সময় বড় মা তাকে না দেখলে অস্থির হয়ে পড়তেন। তখন নূরী বড় হয়েছেন, শহরে থাকেন। লেখা-পড়ার ঝামেলার জন্য বাড়ি যেতে পারতেন না। কিন্তু বড় মা বাড়ি থেকে ঘন ঘন চিঠি লিখতেন। খোঁজ-খবর নিতেন। তখন ভাবনারা তাঁর মনের কোনে বাসা বাঁধতো। বড় মায়ের অনেক কথাই মনে পড়তো। মনে পড়তো নূরীদের ঘরের বারান্দায় পাটি বিছিয়ে "বিষাদ সিন্ধু" পাঠ করতেন বড় মা। তাঁর পাঠের আসরে বাড়ির মহিলা শ্রোতাদের মধ্যে একই রকম গুঞ্জন উঠতো শোকের। মাঝে-মধ্যে তিনি পাঠ করে শোনাতেন কারবালার পুঁথি। নূরী বড় মায়ের পাশে বসে বসে এসব পুঁথি শুনতেন। এসব কথা মনে হলে তিনি বড় মাকে দেখার জন্য পাগল হয়ে যেতেন। ছুটে যেতেন গ্রামের বাড়িতে।

আন্ধার মানিকের নূরী

নূরীর বাবা মাওলানা সালামত উল্লাহ ছিলেন একজন সুবক্তা, অপরদিকে একজন খাঁটি গল্প রসিকও। ভালো স্রোতা পেলে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা গল্পের রাজ্যে হারিয়ে যেতেন। গল্প বলার সময় তুলে ধরতেন ইতিহাসের ঝাঁপি। এটাই ছিলো তাঁর গল্পের' বৈশিষ্ট্য। তার গল্পে থাকতো নিজের দেখা অভিজ্ঞতার কথা, সমকালীন যুগ আর প্রাচীন যুগের ইতিহাসের কাহিনী। পূর্ব পুরুষদের ইতিহাস বর্ণনা করবার সময় তিনি তার বড়ো ভাই, মা, বাবা, দাদা এবং খুনখুনে বৃদ্ধ আত্মীয়দের আধুনিক সংবাদপত্রের

www.phulkuri.org.bd

ভাষায় নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে উপস্থাপনা করতেন। বড়ো ভাই সরদার ওয়ালী উল্লা ছিলেন তার চেয়ে চব্বিশ পঁচিশ বছরের বড়ো। অলি সরদার নামে তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

সানাউল্লাহ নূরীর পূর্ব পুরুষরা মধ্য এশিয়া থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং বংশ পরম্পরায় আরাকান, চট্টগ্রাম এবং এক সময় বৃহত্তর নোয়াখালীর সুধারামের বাবুপুরায়, এরপর নোয়াখালীর পূর্বাঞ্চলের "আন্ধারমানিকে" বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু মেঘনা নদীর গর্ভে ঐ বাড়ি বিলীন হয়ে গেলে প্রথমে নোয়াখালী জেলার ভুলুয়া পরগনার ফরাসগঞ্জে, এরপর ফরাসগঞ্জের বাড়িটিও ভেঙ্গে গেলে লক্ষীপুর জেলার রামগতি থানার চরফলকনে তার পিতা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তার দাদা মরহুম আমিন উদ্দীন ছিলেন একজন উকিল, পিতা মাওলানা সালামত উল্লাহ খিলাফত আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। নানা মুন্সী আবদুর রহমান ছিলেন একজন সুফী ও সাধক।

তার বড় জেঠা সরদার ওয়ালী উল্লাহ থেকে নূরীদের বংশের নতুন সিঁড়িতে উল্লাহ কথাটির সংযোজন শুরু হয়। সে হিসেবে তার ছোট জেঠার নাম সরদার আলী উল্লাহ। তার বাবার নাম হলো, সরদার সালামত উল্লাহ। এভাবে পরবর্তী বংশধরদের সবার নামের শেষে উল্লাহ প্রচলন ঘটে। সে অনুযায়ী নূরী ভাই এর নাম হলো সানাউল্লাহ। মূলতঃ তার দাদা মিয়া রেহান উদ্দীনই তার পুত্রদের নামের শেষে উল্লাহ শব্দ যোগ করেন।

নূরী বাবার মুখে শোনা গল্পগুলোকে মনের মধ্যে গেঁথে ফেলেন। আবার ছোটবেলায় তিনিও কম গল্পের জন্ম দেননি। তার সত্য ঘটনা নিয়ে একটি গল্প শোনা যাক। মাত্র আড়াই বছরে পা দিয়েছে নূরী। স্বাস্থ্যবান শিশু হওয়ায় হাঁটতে শেখার কসরতটা আট নয় মাস বয়সেই শুরু হয়ে যায়। দু'বছরের সময়ে নাকি ফেরিওয়ালাদের হাঁক শুনলে অদ্ভুত সব ধ্বনি তুলে সাড়া দিতেন। একবার এক ফেরিওয়ালা মাটির রকমারি হাঁড়ি-কুড়ির পসরা নিয়ে এসেছিলো তাদের বাড়িতে। তার চড়া গলার হাঁক শুনবার পরই নাকি নূরী ছুটে যায় সবার অলক্ষে। আর অস্পষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে ফেরিওয়ালাকে- ও বেতা, পাতিল কুতু? অর্থাৎ হে পাতিল ওয়ালা, তোমার পাতিলের দাম কত? ফেরিওয়ালার নজর পড়লো ছেলেটির দিকে। আদরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি গো? আমার নাম 'নূলী'। জবাব দেন তিনি। পাতিল নেবে? তোমাল পতিল কুতু? ছোট্ট একটি শিশুর কণ্ঠে

www.phulkuri.org.bd

কতোর জায়গায় কুতু শব্দটি নিয়ে মা ও বাড়ির সবাই কতই না হাসাহাসি করেছেন। দাদী-তো প্রায়ই খেপাতেন, এই নূলী, পাতিল কুতু। আর অমনি তিনি মুচকি মুচকি হাসতেন। মায়ের কোল থেকে কিছুক্ষণের জন্য ছাড়া পেলেই হেলে দুলে উঠানে হাঁসের শাবক কিংবা মোরগ-ছানার পেছনে ধাওয়া করতেন। পরনে নেংটি কিংবা হাফ পায়জামা, কপালের ডান পাশে হিংসুকদের বদনজরকে ঘায়েল করার জন্য সযত্নে আঁকা একটি কালো তিলক। হাতে তার দেড় দুহাত লম্বা একটি বাঁশের কঞ্চি। বড়োদের মতো চোখ রাঙিয়ে "এই এই" শব্দ করে তাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতেন ধান খেকো হাঁস-মোরগগুলোকে। তার কাণ্ড দেখে মা ঠোঁট টেনে হাসতেন।

জ্যৈষ্ঠের দুপুর বেলা। ১৯৩১ সালের জুনের মাঝামাঝি সময়। চারিদিকে খাঁ খাঁ করছিলো রোদ। পূর্ব দিককার উঠানে শুকাতে দেয়া হয়েছিল সিদ্ধ ধান। মা ব্যস্ত ছিলেন রান্না-বান্নায়। কাজের মেয়েরা ছিলো ঢেঁকি-শালে। ব্যস্ততার জন্যে কারোরই খেয়াল ছিলো না। হঠাৎ এক ঝাঁক কাকের চেঁচামেচি আর ডানা-ঝাপটানোর শব্দ শুনে উৎকণ্ঠা হলো বড় মার। প্রথমেই তার মনে হলো হয়তো হল্লা করে রোদে দেয়া ধান সাবাড় করছে এই পাখির দলটি। কিংবা গাছের ডালে পাকা আমের ভোজ উৎসবে মেতে উঠেছে তারা। ঠিক এ সময় নূরীর কথা মনে পড়লো তার।

ঘন্টা আধেক আগে ফুফাতো বোন আমিনার সাথে তাকে খেলতে দেখেছেন তিনি উঠানে। তারা তখন কঞ্চি হাতে নিয়ে কাক তাড়া করছিলো। বড়ো মা নূরীর কথা মনে পড়তেই ছুটে এলেন উঠানে। দেখলেন উঠানটা ফাঁকা। রুদ্ধশ্বাসে ছুটলেন বাগানের দিকে। সেখানেও খুঁজে পেলেন না। বাইরের বাড়িতেও নেই। পুকুর পাড়ে ছিলো অনেকগুলো আম গাছ, কাঁচামিঠা, সিঁদুরে আর দুধাল গাছ ছাড়া ছিলো একটি আম্রতরু। এটিকে বলা হতো, সিদ্দিকার মায়ের আম গাছ। বড় মায়ের খেয়াল পড়লো, কাকদের ঝাঁকটা মাতম জুড়েছে ওই আম গাছগুলোর ডাল থেকে। নীচের ডাল আর মগডালে উড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে তারা যেনো পুকুর পাড়টাকে মাথায় তুলে নাচতে শুরু করে দিয়েছে। কয়েকটি কাক-নাকি তার মাথার ওপর দিয়েও ডানা ঝাপটিয়ে ছুটাছুটি করছিলো। এটা দেখেই তিনি ছুটলেন পুকুর পাড়ের দিকে।

ঘাটের সিঁড়িতে পা রাখতেই তিনি দেখলেন, মাঝ পুকুরের অথৈ পানিতে কাতল মাছের মতন চিত হয়ে ভাসছে নূরী। আর আমিনা ঘাটের ওপর বাঁ-হাতে ভর রেখে ডান হাত

www.phulkuri.org.bd

তার দিকে মেলে ধরে রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গেই বড় মা ঝাপ দিলেন পুকুরে। বড় মা দু'হাতের ওপর ঝুলিয়ে তাকে কিনারে নিয়ে এলেন। আড়াই বছরের একটি শিশু কেমন করে মুখ ওপরের দিকে রেখে ভেসে থাকতে পারে সবাই এটাকে অলৌকিক কাণ্ড বলে মনে করতেন। নূরী বড় হলে বড় মা তাকে এ ঘটনা শুনাতেন। নূরীর কাছে তখন তা গল্পের মতই মনে হতো। তিনি নিজেই বলতেন, পানির প্রতি আমার টান ছিলো।

বিজ্ঞানীরা বলেন পানির প্রতি শিশুর যে টান সেটি হলো সহজাত। আদি মানবের দেহে যে কারণ-বারি থেকে সঞ্চারিত হয়েছে রক্তকণিকা এবং প্রাণ কোষের স্পন্দন, অবচেতনে শিশুমনে রয়েছে তার মহাকালবাহী এক সুতীব্র প্রভাব। তার জন্যেই পানি দেখলে কোন বিধিনিষেধের অপেক্ষা না করে আপন মনের তাগিদে সেদিকে ছুটে যায় শিশুরা। নূরী ও আমিনার জ্যৈষ্ঠের ভরা পুকুরের দিকে ছুটে যাওয়ার পেছনেও হয়তো ছিলো আদিম এই টানটি।

নূরী ভাই কিন্তু তার এ ঘটনাটি অনেকভাবেই বলেছিলেন। তিনি তার শৈশবের এই দুর্ঘটনা থেকে স্বর্গীয় উদ্যানের সুগন্ধের স্পর্শ পেয়েছিলেন। যেখানে অগাধ ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে একটি শিশু বাঁচাতে চাইছে আরেকটি শিশুকে। তার সেই অকৃত্রিম ভালোবাসার জগতে বড়োদের মতন কোনো মনোবিকার, কোন গ্লানি, ঘৃণা, বিদ্বেষ কিংবা পরশ্রীকাতরতার বিন্দুমাত্র ছায়া ছিলো না। যেমন আজ যারা শিশু তারা দেখতে পাচ্ছে প্রেমশূন্য এই যুগের পাপক্লিষ্ট বিদ্বিষ্ট আত্মার উগ্র, উৎকট দুর্গন্ধ। যেখানে শিশুদেরও অধিকার নেই নিরাপদে বাস করার। যেখানে তাদের প্রতিও ঘৃণা এবং নিষ্ঠুরতার চাবুক তুলে আস্ফালন করছে ক্ষমতার রাজনীতির অপদেবতাকুল। অথচ পূর্বে চিত্র এমন বিকৃত ছিলো না। সেখানে শিশু আমিনারা কোন রক্তচক্ষুর ভয়ে বেতসলতার মতো কম্পিত হতো না। বরং তারা স্নেহের সহজাত অনুভূতি নিয়েই বিপন্ন আরেকটি শিশুকে হাত বাড়িয়ে দিতে পারতো বাঁচার আশ্বাস। যে আশ্বাসের অনন্দিত ভুবনটি এখন কেবলই সোনার হরিণ।

এই হল নূরী। যার সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক তার কথা কে না বুঝতে পারে? কে না জানতে চায় তার জীবনের মজার মজার কথাগুলো? তিনি তো ছিলেন ছোট বড় সবার প্রিয় বন্ধু। আমাদের প্রিয় নূরী ভাই। অবশ্য নূরী ভাই, এ কথাটি কারো অজানা নয়। তিনি আমাদের দেশেরই একজন গুণী মানুষ, একজন বড় মনীষী ছিলেন।

দুরন্ত বালক

বাড়িতে সবাই আদর করে ডাকতেন নূরী। তবে মা যেমন আদর করতেন তেমনি আবার কঠোর শাসনের মধ্যেও রাখতেন। কিন্তু বাধ সাধতেন বড় মা। বড় মার জন্য নূরীকে কেউ কিছু বলতে পারতেন না। যত দুষ্টুমিই করুক বড় মার সামনে কেউ রাগ করে নূরীকে কিছু বললে, তার আর রক্ষা নেই। বড় মার প্রশ্রয় পেয়ে নূরী আরো বেশি দুষ্টুমি করতো। কিন্তু যতই দুষ্টুমি করুক না কেন, নূরীকে যে-ই একবার দেখতো আদর না করে পারতো না। আদরে আদরে ভরে দিতো সবাই। এতো সুন্দর ফুটফুটে ছেলের সাথে কি আর রাগ করা যায়? ফলে দুই মা ও বাড়ির সকলের আদর-সোহাগ ও কঠিন শাসনের মধ্যেই নূরীর শৈশব-কৈশোর কেটেছে।

নূরী সারা দিন এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে বেড়াতেন। পাড়ার সব ছেলেদের সাথে নানা খেলায় অংশ নিতেন। পাড়ার ছেলেদের কাছ থেকে এক দুটা নালিশ যে আব্বার কাছে আসতো না তা নয়। আগেই বলেছি, যে ছেলে কোন রশি ছাড়াই তরতর করে নারকেল গাছে উঠে যেতে পারে তার সামনে কি নারকেল ভর্তি গাছ একা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? গাছের ডাব, নারকেল, পেয়ারা, কামরাঙ্গা এসব তো পাড়ার লোকেরা কিছু না কিছু খোয়াতে হতো। ফলে বাবার কাছে একটু আধটু বিচারতো আসতোই। কিন্তু বাবার মান-সম্মানের ক্ষতি হবে এমন কাজ কখনো করতেন না। যা করতেন আমাদের পাড়াগাঁয়ে যাকে বলে দুষ্টুমি। মজার ও আনন্দের ব্যাপার হলো, দুষ্টুমি যাই করুক বালক নূরী প্রকৃতির নির্জনতা আর

রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করতেন। উপভোগ করতেন ঝিঁঝিঁ পোকার গান, পাখির পাখা ঝাপটানো। আবার রাতে যখন ঘুমাতেন তখন ভয়ও পেতেন। তিনি রাত ভর বড় মার মুখে যে গল্প শুনতেন সেটাই ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে যেতেন। বড় মা গভীর অরণ্যের জীব জন্তুর গল্প করতেন। নূরী ঘুম না আসা পর্যন্ত ও সব গল্প নিয়ে ভাবতেন। এক সময় ঘুমিয়ে গেলে স্বপ্নে দেখতেন, গভীর অরণ্যের নির্জনতা ভেঙে বন্য জীবজন্তুরা এগিয়ে আসছে, তখন নূরী চিৎকার করে বড় মাকে জড়িয়ে ধরতেন। বড় মাও তাকে জড়িয়ে ধরে কত আদর যত্নই না করতেন। এক সময় ঘুম ভাঙলে বড় মা নূরীর ভুল ভেঙে দিতেন। ভোর হলে মা তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন নানা আদর আপ্যায়নে।

ঐ সময়ে গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুব কম ছিলো। গ্রামের ছেলেরা ঘরে বসেই মা বা কোন ওস্তাদের কাছে আরবী কুরআন শরীফ ও বাল্যশিক্ষা পাঠ শেষ করতেন। বাল্যশিক্ষা পাঠ শেষ হলে অনেকেই আর উচ্চ শিক্ষার চিন্তা করতেন না। সব বাবারাই লাঙ্গল কাঁধে দিয়ে ছেলেদের মাঠে পাঠিয়ে দিতেন। কারণ তখনতো আর আজকালকার মতো অবস্থা ছিলো না। তখন লোকজনও কম ছিলো। ফলে অভাব ছিলো না। মাঠে প্রচুর ধান হতো। পুকুরে মাছ ছিল, গোয়ালে দুধাল গরু ছিলো এসব কারণে কোন অভিভাবক আর কিছু ভাবতো না। অনেক সময় দেখা যেতো সামান্য বাল্যশিক্ষা গ্রহণ করলেই সবাই সন্তুষ্ট থাকতেন। আবার কেউ কেউ গ্রামের জীবন আর কাঠফাটা রোদে হাল চাষ করে, গরুর ঘাস কাটা শেষ করে স্কুলে রওয়ানা হতো। এখনকার মতো ভাল জামা কাপড়ও তখন ছিলো না। যেন তেন একটা লুঙ্গী, কোন রকম একটা জামা গায়ে দিয়ে পাটের রশি দিয়ে বাঁধা বইগুলো বোগল দাবা করে বহু দূরে কোন এক স্কুলের পথে রওয়ানা দিতো। পায়ে কোন সেন্ডেল জুতা নেই। অনেক সময় সকাল বেলায়ই বাড়ি থেকে শুটকির ভর্তা দিয়ে পান্তা ভাত খেয়ে বইগুলোসহ মাঠে চলে আসতো। খেতের আইলের উপর বই খাতা রেখে হাল চাষে লেগে যেত। এক সময় বাবা বা অন্য কেউ এসে সাহায্য করলেই স্কুলে রওয়ানা করতো।

তোমাদের নূরী ভাইয়ের জীবনটাও এর চেয়ে ব্যতিক্রম কিছু ছিল না। তিনিও এসব কাজে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনিও ভাটিয়ালির সুরে সুরে হারিয়ে যেতেন অচিনপুরে। চলে যেতেন রূপকথার রাজ্যে। সপ্তাহকাল ঘুরে বেড়াতেন। নীল পঙ্কদের সাথে ভাব জমাতেন। ঘুরে বেড়াতেন পাহাড়ে পাহাড়ে কল্পনার রাজ্যে। নদীর পাড়ে যেতেন। নৌকার মাঝিদের কণ্ঠে সুর মিলিয়ে গান গাইতেন। বলতে গেলে একজন কবির মধ্যে ছোটবেলায় যেসব স্বভাব দেখা যায় তার সব কটিই কিশোর নূরীর মধ্যে ছিলো।

শিক্ষা জীবন

পাঁচ বছর বয়সে নূরী মা ও বাবার তত্ত্বাবধানে বিসমিল্লাহ বলা শিখলেন। তাদের বাড়িতেই ছিলো একটি মক্তব। বাড়ির ও পাড়ার সব ছেলে মেয়েরা আসতেন কুরআন শিখতে। এমনকি বয়স্ক মহিলারাও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে আসতেন। মা ছিলেন এই মক্তবের একমাত্র শিক্ষক। বাংলা ও আরবী ভাষা শিক্ষাদান

www.phulkuri.org.bd

ছাড়া ও মা মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু, মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য রত্নের জনপ্রিয় উপন্যাস 'আনোয়ারা', 'গরীবের মেয়ে' এবং বিভিন্ন পুঁথিসাহিত্য পাঠ করতেন। মা-বাবার তত্ত্বাবধানে বাংলা, ইংরেজী, আরবী ও প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা লাভের পর নূরী গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হন। গ্রামের পাঠশালায় প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে ডবল প্রমোশন নিয়ে গঞ্জের এ্যাংলো অ্যারাবিক মাদ্রাসায় ভর্তি হন।

নূরী ছিলেন যেমন প্রতিভাবান মেধাবী ছাত্র তেমনি প্রচণ্ড রকম ডানপিটে। ক্লাসে শিক্ষকদের প্রশ্নবানে জর্জরিত করে ছাড়তেন। তাঁর প্রশ্নের যেন শেষ নেই। অনেক সময় সেসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া ও কঠিন হতো। এ জন্য কোনো কোনো শিক্ষক নূরীকে তিরস্কারও করতেন। আবার কেউ কেউ বিষয়টি বালকের অনুসন্ধানী মনের পরিচয় বলে সহজভাবে মেনে নিতেন। এই মাদ্রাসা থেকে তিনি ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চতর নিউ-স্কীম মাদ্রাসায় ভর্তি হন। মাদ্রাসাটির নাম ছিলো, "হাজির হাট মাদ্রাসা"। এই মাদ্রাসা থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নূরী লেখাপড়া করেন। পিতা মাওলানা সালামত উল্লাহর ইচ্ছা ছেলেকে ল' পড়িয়ে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত করবেন।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। তখন ১৯৪৪ সাল। পৃথিবী জুড়ে বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল। বাবা নূরীকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ গারো পাহাড়ের সানুদেশে, নেত্রকোনা শহরের আঞ্জুমান হাইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন। এখানে মাতুলালয়ে থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন।

এবার উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে তাকে নেশায় পেয়ে বসলো। তিনি চলে এলেন ঢাকায়। জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হলেন। এ সময় নূরী ভাষা আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'তমুদ্দুন' মজলিশের কাজে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। ফলে তিনি জগন্নাথ কলেজ থেকে আইএ ও বিএ পাস করেন। জগন্নাথ কলেজে অধ্যায়ন কালেই তিনি সাংবাদিকতায় জড়িয়ে পড়েন।

দুই মায়ের শাসন ও প্রভাবেই নূরীর শৈশব-কৈশোর ছিল নিয়ম-নীতির ছকে বাঁধা। পরবর্তী জীবনে তিনি তার সকল কাজ-কর্মে অত্যন্ত গোছালো ও কঠোর শৃঙ্খল জীবনের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। তার মূলে ছিলো শৈশবে দু'মায়ের দেয়া শিক্ষা।

কল্পনার রাজ্যে

যার মুখ ছিলো ভোরের সূর্যের মতো, অঙ্গ ছিলো কাঁচা সোনায় মাখা হলুদবর্ণ। ঠোঁটে ছিলো ডালিমফুলের হাসি। নাকটি যেন টিকোল বাঁশি। যে-ই দেখতেন, কাছে এসে একবার আদর না করে যেতে পারতেন না। তাকে দেখলে সবার মন ভরে যেতো। তিনিও এমন ভাব দেখাতেন-

যেন এক পূর্ণিমার চাঁদকুমার। জোছনা রাতে আদুল গায়ে তাকে দেখে মনে হতো বুঝি আকাশের চূড়ায় চাঁদ হয়ে কুটি কুটি হাসছে এক নব কিশোর। হেমন্তের ভোরে ঘুম থেকে জাগলে মনে হতো এই বুঝি ভুবন আলো করে ফুটলো এক রক্তলাল তরুণ অরুণ।

মায়ের চোখের মনি আঁচলের ধন নূরী যেন সেই রাজকুমার। মা কখনো তাকে রোদে নামতে দিতেন না। যদি তার গায়ে দাগ লাগে। মা ডানার ছায়ায় ছায়ায় রাখতেন। বড় মা রাখতেন চোখে চোখে। দুধ থেকে ননি তুলে খাওয়াতেন। মাঠে খেলতে গেলে আঁই-ঢাই করে মায়ের প্রাণ। দুরু দুরু করে বড় মার বুক।

কিন্তু সূর্য যখন আছে তখন তো রোদ হবেই। আর রোদে গেলে অঙ্গতো পুড়বেই। তাই বলে কী নূরী ঘরে বসে থাকবে?

না, তার মন ঘরে বসে থাকতে চায় না। তার কালো ডাগর চোখে ভাসে তামাম দুনিয়ার ছবি। তার দুই চোখের মণিতে জ্বল জ্বল নাচে সাত সাগরের নীল নীল ঢেউ।

তাকে কোলের কাছে নিয়ে ঘুমায় মা। তার পিঠে হাত রেখে ঘুমায় বড় মা। কিন্তু নূরীর চোখ জেগে থাকে অনিমিখ। নিশুত রাতে ঝিরি-ঝিরি বাতাস আসে সাগরের বুক থেকে। সেই বাতাসে নয়াল দ্বীপের মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ। এলাচফুলের মৌ-মৌ সৌরভ। নূরীর মন চলে যায় সাগরের অচীন দ্বীপে। যেখানে লবঙ্গবনে ফোটে থোকায় থোকায় লবঙ্গফুল। যেখানে এলাচবনে মধু খেতে আসে এলাচপরীরা। জোছনার ঝিকিমিকি ওড়না তাদের মাথায়। সেই ওড়না দুলিয়ে তারা নাচে সারারাত। আর ভোর বেলায় বিভোরে ঘুমিয়ে পড়ে এলাচ মধুতে চুমুক দিয়ে।

দুই ডাগর চোখে কত অজানা দেশের স্বপ্ন দেখে ছোট্ট নূরী। রাতে কেবল তারারা জাগে তার সাথে। দুস্তর এক নীল সাগর যেন আকাশটা। আকাশের সেই সাগরে ডিঙার বহর খুলে, সাদা পাল উড়িয়ে ভেসে বেড়ায় নাবিক-তারারা। মিটি মিটি বাতি জ্বলে ডিঙার মাস্তুলে। সেই মাস্তুলে বসে ওরা হাসে কুটি কুটি মুখে। আর মন পবনের গান গায় মনের সুখে।

কলার খোলের জাহাজ বানিয়ে নদীতে ভাসায়। মাস্তুলে খাটায় বকফুলের ধবধবে পাল। জোনাক পোকা ধরে এনে বাতি জ্বালায় ছইয়ের মাথায়। লাল কাঁকড়াকে পাহারা রাখে হালের গোড়ায়। চড়া গলায় বলেঃ দ্যাখো মাঝি, ভুলচুক যেন না হয়। তুফান উঠতে পারে

সাগরে। কিন্তু বৈঠা ধরে রাখবে শক্ত হাতে। লবঙ্গ দ্বীপের পথে আমার পাড়ি। ঠিক মতো চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে জাহাজ। নূরীর এসব কাল্পনিক কাণ্ড দেখে দুরু দুরু করে মায়ের প্রাণ। থরো থরো কাঁপে বড় মার বুক। এ-কী-কাণ্ড করে ছেলে। মা বারণ করতেন তাকে জাহাজ নিয়ে খেলতে। বড় মা বারণ করতেন সাগরের কথা ভাবতে।

এক সময় এসব ভাবনারাই বাসা বাঁধে তাঁর মনের গহীনে। তিনি শৈশবকালের ওসব ভাবনাকে বড় হয়ে কাজে লাগান। ঘুরে বেড়ান দেশ হতে দেশান্তরে। কত নদী, সাগর, মহাসাগর, মহাপ্রাচীর, দেশের পর দেশ ভ্রমণ করেন। ছুটে বেড়ান সারা পৃথিবীর শহরে নগরে বন্দরে। এক সময় যে বালক পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতেন, দুষ্টুমি করতেন, ঐ বালকটি তার পরিণত বয়সে-পক্ষীরাজের মতো ঘুরে বেড়ান অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। তাঁর ওসব সম্পদ আজ আমাদের কাছে জাতীয় সম্পদ হিসাবে আমানত রেখে গেছেন। ব্যক্তি নূরী আজ না থাকলেও ছোট বড় সবার বন্ধু, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক লবঙ্গদ্বীপের সেই রাজকুমারের মৃত্যু নেই। সহজ সরল মনের অধিকারী যে মানুষ সবাইকে ভালবাসতেন, মনের আনন্দে হারিয়ে যেতেন পরীর রাজ্যে, সে মানুষটির কি মৃত্যু হতে পারে? না, তিনি হারিয়ে যেতে পারেন না। তিনি তো বয়সের বেড়াটা দূরে সরিয়ে ছড়া কেটে, গল্প বলে, হাস্য-কৌতুকে মেতে উঠতেন। অতি সহজেই হয়ে যেতেন সকলের প্রিয় মানুষ, প্রিয় বন্ধু। ফলে তিনি আজো আছেন সকলের মনে মনে। হৃদয়ের গভীরে।

মানুষের জীবন সময়ের কাছে বন্দী। এর মাঝে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষ এগিয়ে যায়। বাঁচার জন্য করতে হয় কাজকর্ম। বলতে হয় নানা ধরনের আলাপচারিতা। মানুষের জীবনের প্রথম ভাগের কিছু কথা কিছু কাজ কর্মময় জীবনের ফাঁকে ফাঁকে মনের দোলনায় দোলা দিয়ে যায়। তা-ই হচ্ছে শৈশব স্মৃতি। শৈশবের স্মৃতিগুলো মানুষকে হাসায়, কাঁদায় আবার বেশ শিহরণও জাগায়। ঠিক তেমনি সানাউল্লাহ নূরীর মনের আয়নায় ধরা পড়েছিলো এক এক করে সেই মধুময় ফেলে আসা দিনগুলো, ফলে তিনি তার শৈশব স্মৃতিগুলো গল্পের মতো বলতেন। আবার কলমের খোঁচায়, কালির আঁচড়ে তা লিখতেন। সেখান থেকেই তার ফেলে আসা বিগত দিনগুলোর কিছু কথা এখানে তুলে এনেছি। এসবই আনন্দময় জীবন, ভলোবাসার স্বপ্নময় প্রতিচ্ছবি।

www.phulkuri.org.bd

শিশুদের বন্ধু

আগেই বলেছি, সানাউল্লাহ নূরী ছিলেন চিরসবুজ এক মনীষী। যেন একজন রাজকুমার। গ্রাম-বাংলার আলো-ছায়ায় তার শৈশব-কৈশর কেটেছে। সততা ও মহত্তের বড় সুন্দর ও বিনয়ী এ মানুষটিকে কে না চিনতো, কে না জানতো। যে মানুষ আজীবন দেশের কথা ভেবেছেন, দেশের অসহায় মানুষের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তোমরা যারা ছোট্ট শিশু তাদের জন্যও তিনি কম পরিশ্রম করেননি। কতো কষ্টই না করেছেন তোমাদের মতো ছোট্ট বন্ধুদের জন্যে। দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চষে বেড়িয়েছেন। খোঁজ নিতেন দেশের সকল শিশু-কিশোরদের। তাদের ন্যায্য দাবীর কথা বলতেন, বুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করতেন, তোমরা কেমন আছ বন্ধুরা, যেন সবার আত্মার আত্মীয় তিনি।

নূরী ভাই ছিলেন ক্ষণজন্মা সফল পুরুষদের একজন। বহুমুখী প্রতিভার সমন্বয় ঘটেছিলো তাঁর মধ্যে। তিনি বড় মানুষ ছিলেন। বিখ্যাত সাংবাদিক ছিলেন। অভিজ্ঞ শিশু সংগঠক ছিলেন। পরিবারের যোগ্য কর্ণধার ছিলেন। নিজ সন্তানদের প্রিয় পিতা ছিলেন। তোমাদের মতো সারাদেশের ছোট্ট ছোট্ট ফুলের কুঁড়িদের বন্ধু ছিলেন।

ইতিহাসের নানা বাঁকে বাঁকে তার বিচরণ ছিলো। কোমল ও সুন্দর মনের মানুষ ছিলেন বলে, সব সময় তার মধ্যে একটি শিশুমন বিরাজ করতো। তিনি শিশুদের মতো মান-অভিমান করতেন। আবার সামান্য বিষয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠতেন। শিশুদের সাথে যখন মিশতেন তখন মনে হতো তোমাদের মতো নূরী ভাইও একজন শিশু। ফলে অনেকেই তাকে বুড়ো খোকা বলে মজা করতেন। তিনি খুব সহজেই শিশুদের সাথে মিশে যেতে পারতেন। শিশুদের ভালোবাসার পাত্র ছিলেন। সবাইকে তিনি সমান ভালোবাসতেন। ছোটদের পেলে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করে কাটিয়ে দিতেন। কোলে তুলে আদর করতেন। তিনি পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন, যেখানেই যেতেন সেখানকার মজার মজার বিষয়গুলোকে নিজের মনে গেঁথে রাখতেন, পরবর্তীতে কথার মালা সাজিয়ে দেশের সকল শিশু কিশোরদের মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতেন। তিনি বিভিন্ন শিশু সংগঠন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য সংগঠনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন। যে দেশেই যেতেন, সেদেশের শিশুদের সাথে কথা বলতেন, মিশতেন, ওদের আচার আচরণ রপ্ত করতেন। তা দিয়ে তিনি ছোটদের জন্য কত গল্পইনা লিখতেন। ফলে তিনি ছিলেন ছোট বড় সকলের নূরী ভাই।

www.phulkuri.org.bd

সাংবাদিক ও সমাজ সেবক নূরী

সানাউল্লাহ নূরী কলেজে অধ্যয়নকালে সাংবাদিকতা পেশায় জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে সহ-সম্পাদক হিসাবে ঢাকা থেকে প্রকাশিত অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ইনসান' পত্রিকায় যোগ দেন। এ পত্রিকাটির সম্পাদক ডা. আবদুল ওয়াহিদ চৌধুরী।

www.phulkuri.org.bd

১৯৪৮ সালে নানা কারণে এক বছরের মাথায় ইনসান পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। তখন কলকাতা থেকে 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা মাত্র ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছে। এ পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আকরম খাঁ। সানাউল্লাহ নূরী দৈনিক আজাদের বার্তা বিভাগে যোগদান করলেন। একইভাবে তিনি ভাষা আন্দোলনের নির্ভীক মুখপত্র সৈনিকেও কাজ করতেন। এরপর দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, মাসিক সওগাত, দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক বাংলা, সাপ্তাহিক কিশোর বাংলা, দৈনিক গণবাংলা, দৈনিক দেশ, দৈনিক জনতা, দৈনিক দিনকাল, দৈনিক আল মুজাদ্দেদ পত্রিকায় কাজ করেন।

তিনি দৈনিক পত্রিকায় কাজ করা কালে (১৯৫৯-৭০) ঢাকাস্থ মার্কিন প্রকাশনা সংস্থা ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামসে সহকারী সম্পাদক, সম্পাদক ও প্রধান সম্পাদক হিসেবে এবং ১৯৫৪ সালে আমেরিকান পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা সংস্থা সিলভার বার্ডেট কোম্পানীর শিশু-কিশোর গ্রন্থ বিভাগে সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। তিনি ১৯৫২ সাল থেকে রেডিও, ১৯৬৪ সালে বিটিভির জন্মলগ্ন থেকে উপস্থাপক হিসেবে কাজ শুরু করেন। রেডিওতে প্রচারিত হয়েছে তার শতাধিক কবিতা এবং প্রচুর ছোটগল্প। এ ছাড়া বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা, রেডিও মস্কো, তাশখন্দ টেলিভিশন ও সৌদি বেতারেও প্রচারিত হয়েছে নূরী ভাইয়ের অসংখ্য ভাষণ।

সাংবাদিক হিসাবে সানাউল্লাহ নূরী বহু পত্রিকায় প্রায় অর্ধশত বছর পর্যন্ত বিভিন্নভাবে কাজ করে সাংবাদিকতার উচ্চমান সৃষ্টির প্রয়াস পান। তিনি ছিলেন নিরলস, যোগ্য ও নির্ভীক কলমসৈনিক। ১৯৮৮ সালে তিনি পত্রিকা সম্পাদক ও সংবাদদাতা সংস্থাসমূহের প্রধানদের নিয়ে "বাংলাদেশ কাউন্সিল অব এডিটরস" নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৫৪ সালে সানাউল্লাহ নূরী পূর্ববঙ্গ লেখকসংঘের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশীয় লেখক সম্মেলনে নিজ দেশের প্রতিনিধি দলের উপনেতা ছিলেন। দলের নেতা ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা। কবি সুফিয়া কামাল, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ নূর উদ্দিন প্রমুখ ছিলেন এর প্রতিনিধি দলের সদস্য। এর আগে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে পরিচালিত পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য সমিতির তিনি ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক। এ ছাড়া বাংলা একাডেমী, তমদ্দুন মজলিস, কেন্দ্রীয় ফুলকুঁড়ি আসরের উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি ছিলেন মৃত্যুকাল পর্যন্ত। নূরী ভাই ছিলেন একজন মানবদরদী, অক্লান্ত সমাজকর্মী। এ কারণেই তিনি এতোগুলো সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার সাথে নিজকে জড়িয়ে নিতে পেরেছিলেন।

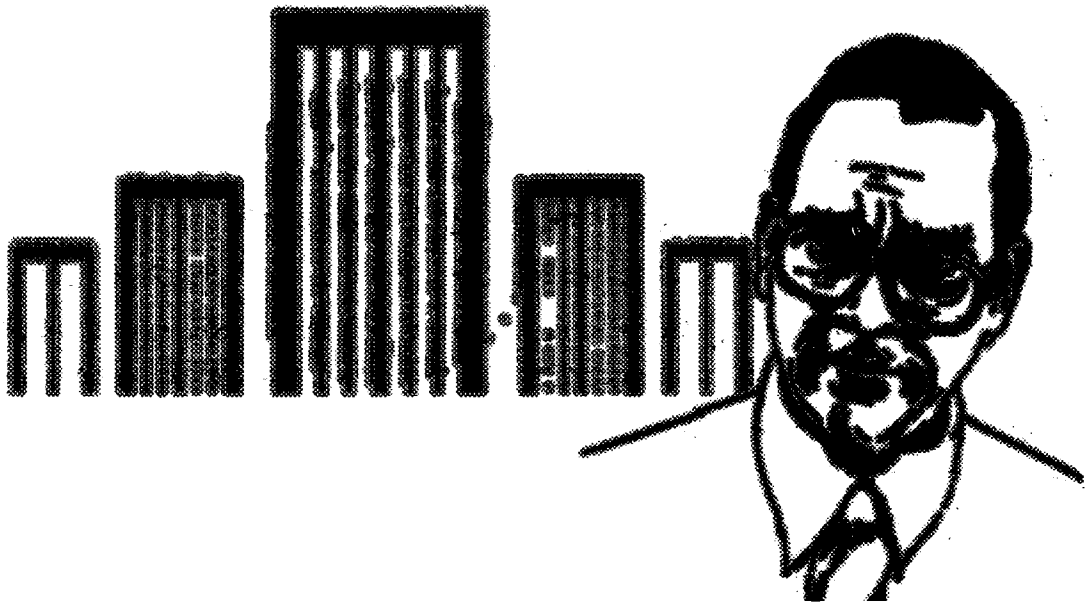

ভাষা সৈনিক নূরী

ভাষা কাকে বলে? ভাষা হলো মনের ভাব প্রকাশ করার মাধ্যম। যেমন ধরো আমরা যেভাবে হাসি, কাঁদি, কথা বলি, আমাদের মনে যে ভাব জন্মে তা অন্যের কাছে প্রকাশ করি। মূলত এটাই হলো ভাষা। পাখি জীবজন্তু ওরাও কথা বলে। ওরাও নিজের ভাব প্রকাশ করার জন্য নানাভাবে ডাকে, ওটাও ওদের ভাষা। সব পাখি-জীবজন্তুর ভাষা বা মুখের ডাক যেমন এক নয়, তেমনি প্রত্যেক দেশের মানুষের ভাষাও এক রকম নয়। এক এক দেশের ভাষা এক এক রকম। যেমন ভারত, পাকিস্তান, চীন, জাপান এমনকি আমাদের বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন।

বাংলা ভাষা। এ ভাষা আমাদের কে দান করেছে? তা হলে আমরা কবি ফররুখ আহমদের একটি গান থেকেই জেনে নিই।

www.phulkuri.org.bd

ও আমার মাতৃভাষা বাংলা ভাষা
খোদার সেরা দান
বিশ্বভাষার সভায় তোমার
রূপ যে অনির্বাণ॥

এই ভাষা হলো আমাদের মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার দান। বিশ্বের বহু দেশ রয়েছে যেখানে গোত্রে গোত্রে সংঘর্ষ হয়, সংগ্রাম হয়। কিন্তু ভাষার মর্যাদা বা ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম হয়েছে এমন দেশ আর কোথাও খুঁজে পাবে না। একমাত্র আমাদের বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠার জন্যই সংগ্রাম করতে হয়েছে। জীবন দিতে হয়েছে। ফলে আমাদের ভাষার মর্যাদা অনেক এবং এর মূল্যও অনেক বেশি। যে জাতির ইতিহাস যত উন্নত সে জাতিও ততো উন্নত। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদেরও ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস হলো অনেক সমৃদ্ধ ইতিহাস। ফলে আমাদেরকে জানতে হবে আমাদের সেই ইতিহাস কি। যেতে হবে মূলে। সত্যিকার ইতিহাস উদ্ধার করতে হলে আমাদেরকে বের হতে হবে শেকড়ের সন্ধানে। আর তা হলো বাংলাভাষার মূল ইতিহাস।

বাংলা ভাষা এমনিতেই প্রতিষ্ঠা হয়নি। এর জন্য ত্যাগ শিকার করতে হয়েছে গোটা জাতিকে। আন্দোলন, সংগ্রাম, এমনকি জীবন দিতে হয়েছে অকাতরে। রক্তে লালে লাল হয়েছে রাজধানীর রাজপথ। এর ফলে জীবন পেয়েছে বাংলা ভাষা। প্রতিষ্ঠা হয়েছে বাংলা ভাষার অধিকার।

বাংলা ভাষার এই অধিকারটা অবশ্যই আমাদের জানতে হবে। আর তা না জানলে আমরা ইতিহাসের একটা মূল্যবান অধ্যায় থেকে বাদ পড়ে যাব। ইতিহাসের পুরনো পাতাগুলো একবার উল্টিয়ে দেখি, আমাদের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসটা কি।

নূরী ভাই জড়িয়ে আছেন আমাদের ইতিহাসের পাতায়।

সেই ১৯৫২ সালের কথা। তখন দেশ ছিলো পাকিস্তান। আমরা যারা পূর্ব পাকিস্তানে বাস করি তাদের ভাষা বাংলা, আর যারা পশ্চিম পাকিস্তানে বাস করতো তাদের ভাষা ছিলো উর্দু। ৫২সালের একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটিই ছিল আমাদের ভাষার লড়াইয়ের দিন।

সেদিন পাকিস্তানের শাসকরা বলেছিলো উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রবাষা। ফলে এর প্রতিবাদ করেছিলো বাংলার দামাল ছেলেরা। এক সাথে শ্লোগান উঠলো "জান দেবো তবু ভাষা দেবো না"। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষ থেকে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ করে দেশের সকল জ্ঞানীগুণী, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, কৃষক, শ্রমিক সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনে। সরকার তা দমন করার জন্যে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছিলো।

অবশেষে ১৪৪ ধারা জারি করে নির্যাতনের আশ্রয় নিলো। গুলী চালালো। জীবন দিলো সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার আরো অনেকে। জন্ম হলো একটি ইতিহাসের। একটি ২১ শে ফেব্রুয়ারির।

মূলত আজকের বাংলাদেশ ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনেরই ফসল। এ লড়াই ছিলো মর্যাদার লড়াই। আর এর ইতিহাস হলো আমাদের জন্য মূল্যবান ইতিহাস। যে ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছেন কিংবদন্তীর প্রাণপুরুষ সানাউল্লাহ নূরী।

আমাদের দেশটা দেখতে খুব সুন্দর! আমাদের দেশে সোনার ধান ফলে, ফলে সোনার পান। আর ঘাটে ঘাটে ভিড়ে সোনার নাও। তাহলে সাগরে? হ্যাঁ, সাগরে বয় সোনার বাও। সবখানেই সোনা। এই জন্যই তো আমাদের দেশকে বলা হয় সোনার বাংলা। এত সুন্দর দেশকি পৃথিবীর আর কোথাও আছে? না, এমন দেশ পৃথিবীর কোথাও পাবে না। "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে, পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি।" আমাদের দেশের কিষাণরা ভোর হলে মাঠে যায়। তারা কোমরে গামছা বেঁধে জমি চাষ করে। তাদের লাঙ্গলের আঁচড়ে উঠে আসে সোনার মাটি। সেই মাটিতেই তো ফলে সোনার ধান। ধান কেটে যখন কিষাণ-কিষাণীরা ঘরে তোলে তখন তাদের প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

চোখ ভরে কিষাণের ফসলের বাহারে
বলে সে একি খাঁটি সোনা আহা-রে!

একি অপরূপ দেশ আমাদের। এই দেশের সুখ দেখে কে। সবার মুখে হাসি। দূর থেকে ভেসে আসে রাখাল ছেলের বাঁশির শব্দ। গভীর রাতে মাঝি মনের সুখে গান গায়। ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, পল্লীগীতি, মাতৃভাষায় গাওয়া এসব গান মন কেড়ে নেয়। ভাবিয়ে তোলে জাগিয়ে তোলে আমাদেরকে মাতৃভাষার প্রেমে।

সানাউল্লাহ নূরী তখন কৈশর পার করে মাত্র যৌবনে পা রেখেছেন। বয়স মাত্র ২০/২১ বছর। জগন্নাথ কলেজের ২য় বর্ষের বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র। প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। প্রথম থেকেই নূরী ভাই তমদ্দুন মজলিসের সাথে জড়িয়ে পড়েন। এই তমুদ্দন থেকেই তো শুরু হলো ভাষার লড়াই। এই লড়াইয়ের একজন সৈনিক হলেন নূরী ভাই। তখন তাদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে ছিলেন অধ্যাপক গোলাম আযম, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, শামসুল আলম, ফজলুর রহমান ভূঁইয়া, আজিজ আহমদ, অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া, নঈমুদ্দীন, অধ্যাপক শাহেদ আলী ও অধ্যাপক আবদুল গফুর প্রমুখ।

www.phulkuri.org.bd

আগেই বলেছি, তখন ইনসান নামে একটি অর্ধ সাপ্তাহিক প্রকাশিত হতো। ডা. আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী ছিলেন এ পত্রিকার সম্পাদক। নূরী ভাই ছিলেন সহযোগী সম্পাদক। তখন বাংলা বাজার থেকে 'সোনার বাংলা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশিত হতো। সোনার বাংলা ও ইনসানে তখন ভাষার উপর নানা ছড়া, কবিতা ও প্রবন্ধ ছাপা হতো। তখন 'ঢাকা প্রকাশ' নামেও একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এ পত্রিকাটি ছিলো খুবই পুরনো। ১৮৫৩ সাল থেকে এ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে আসছিলো। এছাড়া 'চাবুক' নামে আর একটি বাংলা সাপ্তাহিক ও প্রকাশিত হতো। এসব পত্রিকায় মূলত বাংলাভাষা আন্দোলনের উপর নানা ধরনের লেখা প্রকাশিত হতো। এর মধ্যে প্রকাশিত হয় 'সৈনিক' পত্রিকা। কবি ফররুখ আহমদ হায়াতদারাজ খান নামে এ পত্রিকায় লিখতেন। তখন ইনসানের দাম ছিলো মাত্র ছয় পয়সা। এই ছয় পয়সাকে তখন বলা হতো এক আনা। নূরী ভাই তখন বাংলা বাজারের একটি হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ফলে স্কুলের ছাত্ররা সবাই এই পত্রিকা পড়তো এবং নিজেরাই হেঁটে হেঁটে বিক্রি করতো। আমরা বলছিলাম রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের শুরুর কথা এবং নূরী ভাইয়ের ভূমিকা। ১৫ সেপ্টেম্বর 'রাষ্ট্রভাষা উর্দু না বাংলা' এ বিষয়ের উপর একটা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পুরান ঢাকার আরমানিটোলার 'নূরপুর ভিলায়'। 'নূরপুর ভিলা' ছিলো ঢাকা কলেজের একটা ছাত্রাবাস। এই সেমিনারে তিনটি প্রবন্ধ পাঠ হয়। প্রবন্ধ তিনটি লিখেছেন আবুল মনসুর আহমদ, কাজী মোতাহার হোসেন ও প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম। সেমিনারে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, কবি জসীমউদ্দিন, কাজী আকরাম হোসেন, অধ্যাপক শাহেদ আলী ও নূরী ভাই আলোচনা করেন। পরে এই প্রবন্ধ তিনটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। এই সেমিনার ও বই প্রকাশের মাধ্যমেই শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের সংগ্রাম।

১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নূরুল হককে আহবায়ক করে গঠিত হয় ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদ। নূরী ভাই এই সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য এ দেশের অসংখ্য পন্ডিত, কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী কথা বলেছেন। জোর দাবী জানিয়েছেন। প্রতিবাদ করেছেন। সংগ্রাম করেছেন। এই আন্দোলনের সর্বশেষ পরিণতি বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। ৫২ সালে নূরী ভাই দৈনিক আজাদ পত্রিকার সিনিয়র সহকারী সম্পাদক। ২২ ফেব্রুয়ারি নূরী ভাই ঢাকা মেডিকেল কলেজের আমতলায় যেখানে ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের গুলি করা হয় সেখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন। এ জন্য তাকে আজাদে জবাবদিহি করতে হয়। ফলে তিনি আজাদ থেকে পদত্যাগ করে চলে যান। এভাবে তিনিই হলেন ভাষা সৈনিক।

শিশু সাহিত্যিক নূরী

যে সাহিত্য বা রচনা শিশুদের আনন্দ দান করতে এবং তাদের ভেতর পাঠে আগ্রহ বা আকাঙ্খা জাগাতে সক্ষম সে সাহিত্যই প্রকৃত শিশু সাহিত্য। বাংলা শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে সানাউল্লাহ নূরী একটি বিশেষ পরিচিত ও উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি বড়দের জন্যে যেমন লিখেছেন তেমনি একান্তভাবে শিশু সাহিত্য রচনায়ও আত্মনিয়োগ করেন। সানাউল্লাহ নূরী শিশু মনস্তত্ত্ব বুঝতে পারতেন। ফলে তিনি অকৃত্তিম ও নিরলস সাধনাবলে নিবেদিতপ্রাণ একজন সার্থক শিশু সাহিত্যিক হতে পেরেছিলেন। বিশ্ব সাহিত্যের অত্যন্ত আবেদনপূর্ণ কল্প-কাহিনী তিনি খুব সহজ ভাষায় আদর্শ জীবন মহৎ শিশু সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। রূপকথা ও রিয়ালস্টিক ইতিহাসকে গল্পে রূপ দিয়ে শিশু সাহিত্যের ভান্ডারকে আরো ভরপুর করেছিলেন।

সানাউল্লাহ নূরী শিশুদের গল্প বলায় বিশেষ পারদর্শী। শিশু উপযোগী করে সংযত, প্রাঞ্জল ও সাবলীল সহজ সরল বাংলায় তিনি অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে পরিবেশন করেছেন তাঁর গল্পগুলো। সানাউল্লাহ নূরীর ছিলো চিরকালের একটি শিশু মন। শিশু সাহিত্যের উপাদান, ভাষা, বাচন ভঙ্গি নিয়ে তিনি চিন্তা-সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। ইতিহাসের নিরস মহৎ কথা ও জীবন কাহিনী তিনি যে সুন্দরভাবে গল্পের মতো করে ছোটদের বলতে পারতেন, তেমনি আকর্ষণীয় করে সহজ সরল প্রাঞ্জল ও লোভনীয় করে ছোটদের জন্য বই আকারেও প্রকাশ করেছেন। আজীবন যে মানুষটি শিশুদের সাথে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন। শিশুদের মতোই তাদের সাথে কথা বলেছেন। গল্প করেছেন। গান করেছেন। তেমনি নূরীর শিশু সাহিত্যে আনন্দ ও শিক্ষা পরস্পর হাত ধরাধরি করে একই সঙ্গে চলেছে। সানাউল্লাহ নূরী ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, জীবনী, অনুবাদ ইত্যাদি নানান বিষয় ছোটদের উপহার দিয়েছেন।

সানাউল্লাহ নূরী ছিলেন, শিশু মনস্তত্ত্ববিদ। ছোটদের মন- মেজাজ, আনন্দ-বিষাদ, সন্তোষ-অসন্তোষ, উৎসাহ-বিরাগ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিলো প্রচুর। শিশু মনের মধ্যে সূক্ষ্ম সংবেদনশীল জটিল প্রক্রিয়া সদাজাগ্রত করার কাজে সানাউল্লাহ নূরী ছিলেন তার সার্থক রূপকার। তিনি ছোটদের জন্য উপযোগী কালজয়ী শিশু সাহিত্য রচনা করেছেন। মনে হয়, বিশ্ব সাহিত্যের নির্যাসসিক্ত করে তিনি আমাদের কচি-কিশোরদের বড় ভাবনার ও অনাবিল আনন্দের অভিসারী করতে চেয়েছিলেন। আর তাই তাঁর অধিকাংশ শিশুতোষ রচনায় কোনো না কোনো দিক দিয়ে বিদেশী সাহিত্যের রস পাওয়া যায়। রূপকথা ছাড়া তিনি যেন কথাই বলতে চাননি। শব্দ মানে তাঁর কাছে চিত্রকল্প, গল্প মানে রূপকথা। তিনি স্বপ্ন-রাজ্যের শব্দ সম্ভার নিয়ে খেলেছেন সারাজীবন। তাঁর ভাষা আকর্ষণীয়, অনবদ্য। নতুন শব্দ সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সুদক্ষ কারিগর। ভাষাকে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে ভেঙ্গে-চুরে নবরূপ দেয়ার পক্ষপাতি তিনি। ফলে তিনি ছোটদের মনোপযোগী ভাষা সৃষ্টি করে খেলনার এক জগৎ সৃষ্টি করেছেন। বিশ্ব সাহিত্যের বিবিধ রচনা বাংলা ভাষার আদলে বাঙালীর রূপ কল্পের মলাট পরিয়ে তিনি ছোটদের জন্যে পরিবেশন করেছেন সার্থকভাবে। "পৃথিবীর অন্যসব শিশুদের মতো আমাদের শিশুরাও মায়ের কোলে ঘুমায় গান আর গল্প শুনতে শুনতে। আমরা শিশুতোষ গানকে বলি গুম-পাড়ানো গান। আর তাদের গল্পকে বলি রূপকথার গল্প। বাংলা ভাষা সাহিত্যের আদল পাওয়ার বহু আগে আমাদের দেশের মা এবং দাদীরা তাদের সন্তান আর নাতি-নাতনীদের জন্যে মুখে মুখে রচনা করেছিলেন এসব গান আর রূপকথা। শিশুদের চিরায়ত কৌতূহলের জগতটির সাথে আশ্চর্য রকমের

মিল খুঁজে পাওয়া যাবে আদিকালের এই গান আর গল্পের।

আমাদের শিশুদের এ বিশেষ অভাব বোধটির কথা মনে করে সানাউল্লাহ নূরী হাত দেন আমাদের সুপ্রাচীন রূপকথার আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রয়াসে। শিশুরা যাতে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয় সে দিকে দৃষ্টি রেখেই তিনি নির্মাণ করেছেন সব কটি রূপকথার মূল কাঠামো। বঙ্গোপসাগরের সাথে আমাদের জীবনের সংযোগ কতোখানি নিবিড়, তার রূপকথার গল্পগুলো পড়লে তা সহজে তোমরা অনুভব করতে পারবে। সানাউল্লাহ নূরীর শিশুতোষ গল্পগুলোতে প্রচলিত গল্প ও রূপকথার ছোঁয়া আছে। শিশু বোধগম্য বিষয় ও ভাষায় গল্পগুলোর উত্তরণ তাঁর লেখায় বিস্ময়, হাস্যরস, রহস্য রোমাঞ্চ, আদর্শ জীবন বোধের গন্ধ পাওয়া যায়। ছোটদের প্রথমে আনন্দ কৌতুক পরে শিক্ষার বিমল নিকেতনে আহবান করেছেন তিনি।

সানাউল্লাহ নূরী পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াকালেই কবিতা লেখা শুরু করেন। অষ্টম শ্রেণীতে পড়াকালে তিনি দুজন বিখ্যাত ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থ-এর 'লুসি গ্রে' কীটস-এর 'ফায়ারিং সং' কবিতার অনুবাদ করেন। স্কুলে অধ্যয়নকালেই তিনি ছোট গল্প, নাটক ও উপন্যাস রচনায় হাত দেন। দশম শ্রেণীতে পড়াকালে তাঁর রচিত উপন্যাস "আনধার মানিকের রাজকন্যা", যা পরবর্তীতে ১৯৫২ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

তার লেখা বঙ্গোপসাগরের রূপকথা, চীনে পুতুলের দেশ, বুদ্ধি শেখার গল্প, দারুচিনি দ্বীপের দেশে, মঙ্গলগ্রহে সানির পাঠশালা, হাজার এক রাতের শহর, শিশু-কিশোরদের প্রিয়বই। "দারুচিনি দ্বীপের দেশে" সপ্তম শ্রেণীর সাহিত্য পুস্তকে প্রায় দেড় যুগ যাবত পাঠ্য ছিলো। "বিশ্বের প্রথম রিপোর্টার" নূরীর আর একটি মনমাতানো বই। তাঁর দেহে এসো রোম, আমু দরিয়ার বুড়ো, এক দিনের রাজা, উড়তে উড়তে পরীর দেশ-ভ্রমণ কাহিনী, সোনার হরিণ চাই (উপন্যাস) বোশেখ আসে পাগলা ঘোড়ায়, মেঘের নৌকোয় চাঁদের ছেলে (ছড়ার বই), নিঝুম দ্বীপের উপাখ্যান, আন্ধার মানিকের রাজকন্যা, সুজা বাদশাহ বই কয়টি যেন রসে টইটুম্বুর।

সানাউল্লাহ নূরী স্বপ্ন ও কল্পনা বিলাসের পাশাপাশি বাস্তব সমাজ সংস্কার, দেশ ও মানুষের জীবনের কথা লিখেছেন। তার লেখা ছড়া কবিতায় প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের প্রকৃত রূপ ফুটে উঠেছে। তাঁর লক্ষ্য ছিলো একটি সোনার দেশ, সোনার মানুষ। সাহস-বিস্তৃত বক্ষ, হাস্যমুখ খোকা-খুকুদের লক্ষ্য করেই তাঁর শিশু সাহিত্যের সাধনা। শব্দ চয়ন ও ছন্দ বিন্যাসে সানাউল্লাহ নূরী ছোটদের নিকট ছিলেন অতি প্রিয় এক জন লেখক। নতুন নতুন শব্দের উদ্ভাবন এবং মিঠেল ধ্বনি দ্যোতনার মধ্যদিয়ে তিনি ছড়া-কবিতায় ছোটদের মন

www.phulkuri.org.bd

জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর গদ্য রচনার আকর্ষণীয়তা প্রবল। প্রতিটি শব্দ এবং লাইন যেন ছন্দে ছন্দে দোল খায়। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ যে কোনো রচনাতেই তিনি শিশুদের মন-মেজাজ, বয়স এবং পরিবেশ যাচাই করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। ফলে সার্থক শিশুতোষ রচনাকার রূপে বাংলা শিশুসাহিত্যে তিনি আসন করে নিয়েছেন। সানাউল্লাহ নূরীর শিশুতোষ রচনা-

বোশেখ আসে পাগলা গোড়ায়
উথাল-পাথাল ঘূর্ণি হাওয়ায়
ধুলো উড়ায় কুলো উড়ায়।

তাতা-থৈই থৈই নাচন নাচে
ঝাপটা মারে গাছে গাছে
কচকচে আম থরে থরে
ঝর ঝরিয়ে পড়ে ঝরে।
(বোশেখ আসে)

বোশেখ আসে পাগলা ঘোড়া, সানাউল্লাহ নূরীর একটি ছড়ার বইয়ের নাম। এই বইটিতে ছোট-বড় মোট ১২টি ছড়া রয়েছে। তিনি বাংলা বার মাসের উপর এই ছড়াগুলো লিখেছেন। তার বোশেখ আসে পাগলা ঘোড়ায় ও মেঘের নৌকায় চাঁদের ছেলে ছড়ার বই দু'টি অথবা তাঁর কাব্যগ্রন্থ আন্দোলিত জলপাই ও শান্তির পদাবলী প্রমাণ করে তিনি একজন কবি।

সানাউল্লাহ নূরীর মধ্যে ছিলো গল্প বলার মজলিসী ঢং। ছোট ছোট বাক্যে চলতি ভঙ্গিতে নানান শব্দের মিশ্রণে তিনি বাংলা শিশু সাহিত্যে একটি নতুন সংযোজন করেছেন। ছোটদের আসর সাজিয়ে যেন গল্প দাদু অতি কাছে থেকে মাথা নেড়ে, হাত ঝেড়ে, একটু একটু করে গল্পের ঝুড়ি উজাড় করে দিয়েছেন। আর নিকট-স্পর্শে ছোটদের সে গল্প শুনিয়েছে অবাক বিস্ময়ে, সরল আহবানে।

সানাউল্লাহ নূরীর আচরণ, চাল-চলন, কথা বলার ঢং সব কিছুতেই শিশুতোষ ভাব ছিলো। ফলে তিনি শিশুদের সাথে মিশতে পারতেন, শিশুদের মতো কথা বলতে পারতেন। আর শিশুদের মনের কোঠরে লুকায়িত তথ্যগুলো আহরণ করেই তিনি রচনা করতেন তার শিশু সাহিত্য। ফলে সানাউল্লাহ নূরীর শিশু সাহিত্যের ওজন অনেক বেশি। এ কারণে তিনি একজন সার্থক শিশু সাহিত্যিক ও কবি।

www.phulkuri.org.bd

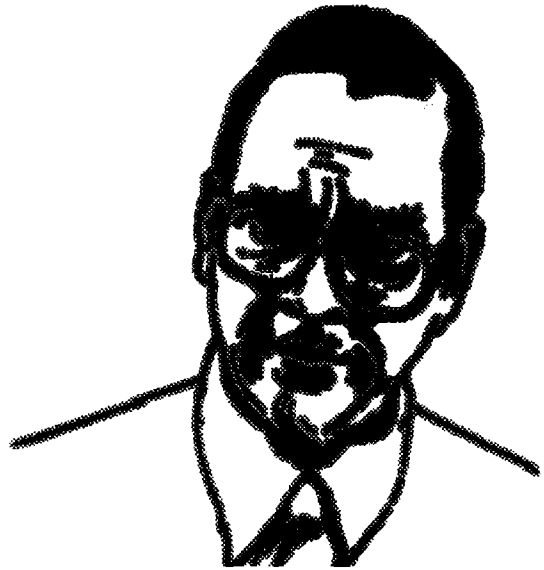

বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নূরী

নূরী ভাই পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন। এসব দেশ ভ্রমণ করতে গিয়ে তিনি পাড়ি দিয়েছেন বহু সাগর, মহাসাগর। কত বনবনানী-পাহাড় নদীতে বিচরণ করেছেন তিনি। তার দেশ বিদেশের সৃষ্টিময় লেখার পাতা উল্টালেই ওসব জানা যায়। তিনি ওসব দেশকে নিয়ে তার দেখাকে গল্পে সাজিয়ে বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এসব দেশ ভ্রমণ করতে গিয়ে নূরী ভাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ও সাক্ষাৎ করেন। যে সব বড় মানুষের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল- ইংল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার, রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ, ইথিওপিয়ার পরলোকগত সম্রাট হাইলে সেলাসী, পরলোকগত সউদি বাদশা খালেদ, ভারতের পরলোকগত রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ, পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি বেঙ্কটরমন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও, ইন্দোনেশিয়ার পরলোকগত উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর আদম মালিক, চীন ও রাশিয়ার উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সানাউল্লাহ নূরী সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন।

অধ্যাপক আবদুল গফুর, শাহেদ আলী, আবদুল গনি হাজারি, সিকান্দার আবু জাফর, ফয়েজ আহমদ, জহুর হোসেন চৌধুরী, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, আহমেদ হুমায়ুন, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, নির্মল সেন, ফজল শাহাবুদ্দিন, তোয়াব খান, আহসান হাবীব, মাওলানা আকরম খাঁ, মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন, মুজিবুর রহমান খাঁ এবং আরও অনেকের দুর্লভ সাহচর্যে কাজ করেন তিনি।

www.phulkuri.org.bd

এক নজরে নূরী

নাম - সানাউল্লাহ নূরী।

জন্ম - ১৯২৮ সালের ২৮ মে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চরকলকন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা - মাওলানা সালামত উল্লাহ।

দাদা - আমিন উদ্দীন।

নানা - মুন্সী আবদুর রহমান।

শিক্ষা - তিনি নোয়াখালী, মোমেনশাহী, নেত্রকোণা ও ঢাকায় পড়াশোনা করেন। জগন্নাথ কলেজ থেকে ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন।

সাংবাদিকতা - ১৯৪৭ সাল থেকে আমৃত্যু সাংবাদিকতা পেশায় জড়িত ছিলেন।

বিদেশ সফর - সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইংল্যাণ্ড, গ্রীস, জাপান, সৌদি আরব, চীন, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, হংকং, নেপাল, ইরাক, ইরান, কুয়েত, আরব আমিরাত, জর্ডান, লিবিয়া, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়াসহ বিশ্বের বহুদেশ সফর করেন।

পদক ও পুরস্কার- ১৯৮২ সালে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে সানাউল্লাহ নূরীকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়।
বাংলা সাহিত্য পরিষদ পদক
অতীশ দীপংকর স্বর্ণপদক
শহীদ জিয়া স্মৃতি স্বর্ণপদক
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন স্বর্ণপদক
কালচক্র স্বাধীনতা স্বর্ণপদক,
বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা গুণীজন সংবর্ধনা পদক
ভারত থেকে প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোক সাহিত্য গবেষক ড. দীনেশ সেন ময়মনসিংহ গীতির প্রখ্যাত সংকলন স্বর্ণপদকসহ ৫০ টিরও বেশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদক ও সম্মাননায় তিনি ভূষিত হন।

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

উপন্যাস - আনধার মানিকের রাজকন্যা ২. নিজুম দ্বীপের উপাখ্যান ৩. রোহিঙ্গা কন্যা
৪. আফ্রিকান আমার ভালোবাসা ৫. সোনার হরিন চাই (কিশোর উপন্যাস)

শিশুতোষ গ্রন্থ- ১. বুদ্ধি শেখার গল্প ২. মানুষ যাকে ভুলেনি ৩. দারুচিনি দ্বীপের দেশে
৫. আমু দরিয়ার দেশে ৬. রূপকথা দেশে দেশে
৭. মঙ্গলগ্রহে সানির পাঠশালা
৮. হাজার এক রাতের শহর ৯. ছড়ার এক রাতের শহর

কাব্যগ্রন্থ - আন্দোলিত জলপাই ২. নিবেদিত পংক্তিমালা ৩. শান্তির পদাবলী

অনূদিত গ্রন্থ - আদিগন্ত ২. মোহক নদীর বাঁকে ৩. স্বর্গের এ প্রান্তে
৪. সবুজগ্রন্থ, কর্ণেল গাদ্দাফী'র গ্রীন বুকের বঙ্গানুবাদ

সাংবাদিকতা - সাংবাদিকতার অগ্নিযুগ ২. ভাষার বিবর্তনে সংবাদপত্রের ভূমিকা
৩. সাংবাদিকতার ইতিহাসঃ প্রাচীনকাল, মধ্যযুগ ও বর্তমান কাল
৪. বিশ্বের প্রথম রিপোর্টার ৫. ছাপাখানা থেকে সংবাদপত্র

অন্যান্য গ্রন্থ - বাংলাদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা ২. হিউয়েন সাং যখন এলেন এদেশে

www.phulkuri.org.bd

৩. নোয়াখালী ভুলুয়ার ইতিহাস ও সভ্যতা৪. স্বাধীনতা বিপ্লবের মহানায়ক
৫. উপমহাদেশের শতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধ
৬. ইউরোপের পুনর্জাগরণে ইসলামের অবদান ৭. মহানবীর বিশ্ব চিন্তা
৮. মহানবীর রাষ্ট্রদর্শন ও পররাষ্ট্রনীতি ৯. পৃথিবীর দেশে দেশে ভ্রমণ
১০.আলেখ্য

অপ্রকাশিত রচনাবলি

বিশ্ব সাহিত্য জানালা, বাংলার কৃষক বিপ্লব, ফকির মজনু থেকে তিতুমীর, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিকথা, শাহজাদী জাহান আরা (উপন্যাস), প্রত্নপ্রস্তর যুগের বাংলা (ইতিহাস), বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন, আর যুদ্ধ নয় (কাব্যগ্রন্থ - যন্ত্রস্থ) সাংবাদিকতায় ও কাব্যে নজরুলের বিদ্রোহ, সাহিত্যে অগ্রচারণেরা, ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি, বিশ্বের সেরা শিশু, যখন সাংবাদিক ছিলাম, বঙ্গোপসাগরীয় সভ্যতা, মহাপ্রাচীরের দেশে, বিশ্বের সেরা শিশু, ভাষার বিবর্তনে সংবাদপত্রের ভূমিকা, দূরন্ত (কিশোর উপন্যাস) পথচলতে দেখা, রাজনীতির সদর-অন্দর, দারুচিনি দ্বীপের দেশে, লোহিত সাগরের পাড়ে, উপমহাদেশে হত্যার রাজনীতি, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিশ্বসাহিত্য ও সুফী দর্শন, স্মৃতি কথা, আমার ছেলেবেলা ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্যের একাধিক শাখাকে সানাউল্লাহ নূরী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সমৃদ্ধ করেছেন। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, রূপকথা, ইতিহাস, অনুবাদ, জীবনী গবেষণা গ্রন্থ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার শৈল্পিক বিচরণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সানাউল্লাহ নূরী আজ আর আমাদের মাঝে নেই। আমাদের কাছে নূরী ভাই আজ এক স্বপ্নের পুরুষ। তিনি ১৯০১ সালের ১৬ জুন বিদায় নিয়েছেন এ পৃথিবী থেকে। আজ-

নূরী ভাই নেই! নূরী ভাই নেই
সেই কথা ঘোরে ফেরে চতুর্দিকেই।
পাতা কাঁপে ফুল কাঁপে কাঁপে নদী তীর
বুকে বুকে সেই ব্যাথা কাঁপে ঝির ঝির।
তিনি নেই এই খানে আছে তার কাজ
তবুও আছেন তিনি নিখাদ নিভাঁজ।

www.phulkuri.org.bd

সবার প্রিয় সানাউল্লাহ নূরী

শরীফ আবদুল গোফরান

www.phulkuri.org.bd